Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 82 - 88
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর নির্বাচিত ছোটগল্প : প্রসঙ্গ শিশু শ্রমিকের জীবন যন্ত্রণার আখ্যান

মহাদেব মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ
ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা
Email ID : mahadeb.mandal05@gmail.com
ও
অর্ণব চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ
ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Child Labour, Prevention, Law, Civilization, Economic Problem, Shishu shramik.

Abstract

Every parent's passionate prayer for the well-being of their child is that their child should be happy with milk and rice. But due to economic disparity in their social standard, family dysfunction and other environmental reasons, it becomes impossible for every parent to provide for their children. Reluctantly, the burden of the family is placed on their shoulders instead of the school bag. As a result, those underprivileged children are found in factories, tea shops, and even as maids in the master's house. They have to lose their childhood and become child Labourers. As civilization reaches the peak of development along with globalization, the number of these terrible diseases increases in the society. In 2011, India's national census showed that the total number of child labourers in India would be 10.1 million out of 259.64 million children aged [5–14] years. The problem of child labour is not unique to India; Globally, approximately 217 million children work regularly, many full-time. Various legislations had been enacted to find solutions to this problem. Besides, writers are the most sensitive beings in the society. Therefore, the story of child labour or becoming a child labourer is repeatedly struck in the minds of writers. They sensed that human civilization was about to face a deep crisis. Their thinking power has been shaped through the creation of literature. So they moved away from the traditional approach of child literature and made child labour a subject of literature. Swapnamoy Chakraborty is one of the writers whose writings on child labour became a major topic during the post-independence era. Swapnamoy Chakraborty makes child labour a major issue in his stories. In his stories 'Kanane Kusum Kuli', 'Sarshe Chhola Maida Ata', 'Bhalo Kore Porga eshkule', the picture of the terrible problem like child labour is

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 82 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

beautifully revealed. The main objective of this paper is to find out how in these stories the author tries to break the human mind to get rid of child labour.

Discussion

সাহিত্য আসলে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। তাই অনায়াসেই সমাজের ঘটে যাওয়া নানান সামাজিক সমস্যার কথা সাহিত্যের পাতায় উঠে আসে। শিশুদের জন্য সাহিত্য দীর্ঘ দিন ধরে রচিত হয়ে আসছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশুসাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। সন্তানকে মা-বাবা দুধে ভাতে রাখতে চাইলেও আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক কারণে প্রত্যেক পিতা-মাতার সন্তানের 'দুধে ভাতে' থাকার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সতজিৎ রায়ের হাত ধরে বাংলা শিশুসাহিত্যের ধারা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়েছে। তাঁদের বেশীর ভাগের লেখায় ছিল শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য নানান মজার মজার হাস্যকর কল্প কাহিনি, যা পাঠ করে শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়তা দান করে থাকে। কিন্তু আমরা যদি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের শিশু সাহিত্যের ধারাকে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখা যায় শিশুসাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্যের স্বাদ বদল ঘটে। শিশু সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে শিশুদের নানান সামাজিক সমস্যা ও অসহায়তার কথা। অর্থনৈতিক অনটনের দরুণ শিশুরা তাদের শৈশব হারিয়ে ফেলে কাঁধে তুলে নেয় সংসারের ভার। ফলস্বরূপ স্কুলছুটের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তার ফলে শৈশবের আনন্দ হারিয়ে তাদের কাজ করতে হয় কলকারখানা, অন্যের বাড়ি, দোকান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। শৈশবের ম্লান শুভ্র জীবন ত্যাগ করে তাদের পরিনত হতে হয়— শিশুশ্রমিকে। শিশুশ্রম ভারতের প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে। বর্তমান দিনে ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারন করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যে সরাসরি ভাবে শিশুশ্রমের কথা পাওয়া না গেলেও অনেকের রচনায় তার আভাস লক্ষ করা যায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' উপন্যাসে বালিকা রাধারাণী মায়ের অসুখের পথ্য যোগার করবার জন্য মাহেশের রথের মেলায় ফুলের মালা বিক্রি করতে যায়। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পেও দেখা যায় রতনকে কলকাতা থেকে আগত পোস্টমাস্টারের বাড়িতে কাজ করতে। রতন পড়াশুনাও জানে না। পোস্টমাস্টারের লেখাপড়া শেখার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। আসলে রতনের শিশুমন স্ব-ইচ্ছায় লেখাপড়া ত্যাগ করে শৈশবের মুহূর্তগুলো হারাতে চায় না। সমাজ পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করে তোলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তালনবমী' গল্পেও একই ছবি ধরা পরে নেপাল ও গোপাল নামক চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে। তারাও সংসারের অকুলান চোখের সামনে দেখতে না পেরে রাতের অন্ধকারে অন্যের জমি থেকে শাক তুলে ও তাল কুড়িয়ে হাটে বিক্রি করে। দুটি শিশু চরিত্রের অন্তর্বেদনা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত করে তুলে ধরেছেন গল্পকার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পেও দেখা যায় কাঙালীর জীবনের করুন পরিণতি। সমাজে ছোট জাত হওয়ার দরুন সে তার মায়ের শেষ ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত পূর্ণ করতে পারিনি।

শৈশব হল মানব জীবনের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের সুনাগরিক হয়ে দেশকে খ্যাতি চূড়ায় পৌঁছে দেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা অনেক শিশুই প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের, সুযোগ পায় না। অঙ্কুরেই তারা বিনষ্ট হয়ে যায়। তারা শিক্ষার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকার জগতে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। স্কুলের গণ্ডির বাইরে তাদের দেখা মেলে কলকারখানায়, চায়ের দোকান, মনিবের গৃহ, এমনকি হোটেলের কর্মচারী রূপে। কর্মস্থলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মালিকের অপব্যবহারের দ্বারা শিকার হয়। কম বেতনে শিশুদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা সমাজে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। শুধু বর্তমান সমাজে নয় প্রাচীনকাল থেকে অভিজাত উচ্চবিত্ত পরিবারে শিশুদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা ছিল, যা 'শিশুদাস' প্রথা নামে পরিচিত। এই ধরনের শিশুশ্রম তৎকালীন সমাজে তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি। তবে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে শিল্প, কৃষি ও নগর সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তাইতো সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলতে শুনি –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 82 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"
(সুকান্ত ভট্টাচার্য/ 'নবজাতক'/ 'ছাড়পত্র')

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে। যার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতও শিশুশ্রম বিরোধী একাধিক আইন প্রণয়ন করে। যেমন— 'Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, Marchant shiping Act, 1958, Motor Transport Act, 1951, Mines Act, 1951, এবং Plantation Labour Act, 1951। প্রতিটি আইনের মাধ্যমে শিশুশ্রমিক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা 'শিশুশ্রম' মুক্ত সমাজ গড়তে অসমর্থ। বিশ্বজুড়ে যখন শিশুশ্রম বিরোধী শ্লোগান জোড়ালো ভাবে দেখা দেয় অন্য দিকে তখন বাংলার সংবেদনশীল শিল্পী সাহিত্যিকরাও নীরব থাকতে পারেননি। তাঁরা অনুভব করতে পেরেছিলেন মানব সভ্যতা এক গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তাঁদের এই চিন্তনশক্তি রূপ পেয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। তাই তাঁরা শিশু সাহিত্যের গতানুগতিক পন্থা থেকে সরে এসে শিশুশ্রমকে সাহিত্যের বিষয় করে তুললেন। তাই অনায়াসেই তাঁদেরর দরদী কলমে শিশুশ্রমের প্রসঙ্গ উঠে আসে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত সাহিত্যিকদের লেখায় শিশুশ্রম বিষয়টি প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আখ্যানকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মতো। তাঁর গল্পে ভণ্ড জ্যোতিষী, অঙ্গ-বিক্রয়, প্রোমোটারি, রক্ত নিয়ে ব্যবসা, দুর্নীতি, শিশু-শ্রম, জাতি বৈচিত্র্য, বেকারত্ব প্রভৃতি আমাদের সমাজের চারিদিকের চিরপরিচিত সমস্যাগুলি— অবলীলাক্রমে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর 'ভালো করে পড়গা ইস্কুলে', 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা', 'কাননে কুসুমকলি', গল্পগুলিতে শিশুশ্রমের মত ভয়াবহ সমস্যার চিত্র চমৎকার ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

'ভালো করে পড়গা ইশকুলে' (প্রমা ১৯৮০)শিশু দিবসের আখ্যানে রচিত একটি অপূর্ব গল্প। শিশুদের অধিকার শিক্ষা এবং কল্যাণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শিশু দিবস পালিত হয়। কিন্তু আমরা শিশু দিবসের মূল লক্ষ্যই ভুলে গেছি। বর্তমানে স্কুলগুলিতে শিক্ষকরা শিশু দিবসে শিশুদের লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত না করে শুধু বিস্কুট বিতরণ করেই শিশু দিবস উদযাপন করে থাকেন। তাই স্কুল থেকে ছাত্ররা হারিয়ে যায়, পরিণত হয় শিশু শ্রমিকে। সমাজের নিচু তলার মানুষেরা বুঝতেই পারেনা শিশুরাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর প্রধান সম্পদ। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের জোর করে কম বয়সে কাজে ঢুকিয়ে দেয় টাকার লোভে, বেঁচে থাকার তাগিদে, জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে। তাইতো সন্ধ্যাদের কাছে শিশু দিবসে 'ডাকঘর' নাটকের সুধার অভিনয় থেকে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে বিক্রি করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এই করুন কাহিনি নিয়ে সমাজ সচেতন কথাশিল্পী স্বপ্নময় চক্রবর্তী নির্মাণ করলেন 'ভালো করে পড়গা ইশকুলে' গল্পের আখ্যান। এই গল্পে উঠে এসেছে সমাজের উচ্চবিত্ত পরিবারের শিশুদের অবস্থান এবং সমাজের নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের অবস্থানের যে আসমান জমিন ফারাক তার এক করুন রূপ। যেখানে টুম্পা নদীর ধারে বসে বসে রঙিন ছবি আঁকছে তার পাশ দিয়েই হারান আর কার্তিক মাথায় গাট্টি কচুর বোঝা নিয়ে ছ'মাইল হেঁটে শহরে বিক্রি করতে যাচ্ছে। টুম্পা যেখানে রাখাল জীবনের কাহিনি হিসেবে জানে গাছের ডালে বসে বাঁশি বাজানো, সেখানে বাস্তব রাখালরা পড়াশোনা ছেড়ে মানুষের বাড়িতে কাজ করে শুধুমাত্র দু'মুঠো ভাতের জন্য।

গল্পকথক তারিখ ধরে ধরে শিশুরা কীভাবে স্কুল ছুট হয়ে শিশু শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে তার বর্ণনা লিখে রেখেছেন ডাইরিতে। সেই বর্ণনায় দেখি—

"১৭ ই নভেম্বর
এখন ধান উঠেছে। মাঠের কাজ করলে পয়সা পাওয়া যায়। ছেলেপুলেরা গতরখাটা বাপকে সাহায্য করতে গেছে। বড়লোকের ছেলে মেয়েরাই আছে এখন স্কুলে। একটা লোক এল। ...আমার বেটা গণেশকে একটু ডেকে দেন। গণেশকে পাঠালাম। ক্লাসের বের হতেই গণেশের ঘাড় চেপে ধরল ওর বাপ। শুয়ারের পো, বাবু হবার শক্ পোঁদে ঢুইক্যে দিব। হাত থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 82 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> শ্লেট নিয়ে পায়ে মাড়িয়ে দিল। রোজ রোজ বইলছি মাঠে যে ধানগুলো বাবুবাড়ি পৌঁছে দে আয়,— আমি এই গুষ্টি গিলুব, — আর বেট্টা বাবু হঁনছে– অ্যাঁড় ছিনছে দুব।"[১]

গণেশ স্কুলে আসতে চায়। পড়তে চায়। সে বই পড়ে দারোগা হতে চায়। কিন্তু পেটের দায় বাবার আদেশ তাকে স্কুলে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। অবশেষে ১লা ডিসেম্বর গল্পে আমরা দেখতে পাই গণেশের বাবা মারা গেছে। ফলে–

> "গনশা দুর্গাপুরের চায়ের দোকানে কাজে লেগেছে।"[২]

গণেশের যে ইচ্ছা ছিল পড়াশোনা করবে দারোগা হবে তা পূরণ হওয়ার বদলে গণেশ পরিণত হয়ে গেছে শিশু শ্রমিকে। এভাবেই সমাজের নিচুতলার হাজার হাজার শিশু পেটের দায়ে পরিবারের চাপে স্বপ্ন থাকা সত্ত্বেও প্রথমে স্কুল ছুট হয়ে পড়ছে এবং পরে শিশু শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। তাইতো সামনে পরীক্ষা চলে আসলেও ৩রা ডিসেম্বর দেখা গেছে গ্রামের স্কুলে আর কোন ছাত্রই নেই। আর ৭ই ডিসেম্বর গনশার বই দিয়ে তার মা ঠোঙ্গা বানিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। এভাবেই কতশত শিশুর স্বপ্ন ঠোঙ্গা হয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজে তার হিসাব আমরা রাখি না।

সমাজের নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের করুন চিত্র উঠে এসেছে ২৮ শে নভেম্বরের কাহিনিতে –

> "কাঙালের বয়স কত? ১২/১৩ হবে। ওকে দেখলাম একটা ন্যাকড়া একটা ষাঁড়ের মূএযন্ত্রে বারবার লাগাচ্ছে। ভাবলাম এটা বালক বয়সের দুষ্টুমি। আমি ধমক দিলাম। – একী হচ্ছে বাঁদরামো। — নালুই বানাচ্ছি মাস্টার।... এই নালুইটা গাইয়ের মুখের সামনে ধরলে আর নাপাবেনি চুমমেরে থাইকবে।"[৩]

একটি বাচ্চার জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আমাদের বিস্মিত করে। আবার গল্পের শেষ লাইনে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেছেন–

> "সন্ধ্যার সারা মুখে লেপটানো কাজল। ও এখন অন্য সুধার অভিনয় দেখবে। এর আগে একবার হিসাব করার চেষ্টা করে দেড় টাকা শ' হলে দেড়শ ঘুঁটের দাম কত।"[৪]

শিশু দিবসে স্কুলে অভিনিত 'ডাকঘর' নাটকে সন্ধ্যার সুধার অভিনয় করার কথা ছিল। কিন্তু পেটের দায় আর সংসারের অভাব তাকে নিয়ে যায় মাঠে গবোর কুঁড়োতে। সেই সুযোগে সমাজের ধনী শ্রেণির প্রতিনিধি সুখের পরি টুম্পা তার জায়গায় অভিনয় করে। এভাবেই দরিদ্র কিশোর-কিশোরীর স্বপ্ন সমস্ত কিছুই ভোগ করে সমাজের উচ্চ শ্রেণির তথা বিত্তশালীদের শিশুরাই। সময় সচেতন শিল্পী স্বপ্নময় চক্রবর্তী ধনিক শ্রেণি কীভাবে দরিদ্র শিশুদের স্বপ্নগুলি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের শিশুদের সুখের বস্তু করে তোলে তা গল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। গল্পকার এই গল্পের মাধ্যমে সচেতন করতে চেয়েছেন সাধারণ পাঠকদের এবং শিশুদের প্রকৃত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বার্তা সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' (প্রথমা, ১৯৮১) গল্পে গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন। লেখক সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তুলে এনেছেন সমাজের নিচু তলার শিশুদের করুণ জীবন কাহিনি। এই সময়ে দাঁড়িয়েও সমাজের কিছু পরিবারে শিশুদের কাছে পড়াশোনাটা একটা বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। যেসব পরিবারের দুবেলা দু'মুঠো খাবার জোটে না সেই পরিবারের শিশুরা যে পড়াশোনার কথা না ভেবে অন্য সংস্থানের কথা ভাববে সেটাই স্বাভাবিক। এরকম পরিবারের দুই কিশোর এই গল্পের প্রধান চরিত্র পরান ও গোবিন্দের জীবন আখ্যান বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। তাদের দুজনের বাবা মারা গেছে। তাই সংসারের দায়িত্ব, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ, এখন তাদের নিজের উপরেই। গোবিন্দের বাবা মারা গেছে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে ঝড়ে নৌকাডুবিতে আর জঙ্গলে গাছ ও মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘে খেয়েছিল পরানের বাবাকে। তাই তাদের জীবন এখন গভীর সংকটে। তাইতো পরান বলেছে –

> "মোদের ইচ্ছায় কী মোদের জীবন চলে।"[৫]

পিতার মৃত্যুর পর দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ইচ্ছার কোন দাম থাকে না তা পরানের এই কথায় যেমন প্রকাশিত তেমনি তা সামাজিকভাবেও সত্য। তাইতো পরান ও গোবিন্দও পরিনত হয়ে গেছে শিশুশ্রমিকে। বকখালি থেকে পাঁচ ছয় কিমি দূরে জম্বুদ্বীপ, সেখানে মাছ শুকানোর কারবার চলে মহাদেব দাসের। সেই খুঁটিতে দুই কিশোর গোবিন্দ ও পরান কাজে নিযুক্ত হয়। গোবিন্দ নোয়াখালী জেলা আর পরান গোসাবার কয়েদখালী গ্রাম থেকে এখানে এসেছে।

এই জম্বুদ্বীপে কাজে আসার আগে দারোগাবাবুর হোটেল ‘বালুকা বেলায়’ হোটেল বয়-এর কাজ করেছে পরান। তার মা এই হোটেলের বাসন মাজার কাজ করত। এখান থেকেই মহাদেব দাস বেশি টাকার লোভ দেখিয়ে পরানকে জম্বুদ্বীপে নিয়ে এসেছে। হোটেল মালিক বলেছে –

> “পরানের এই কাঁচা বয়েস-মাছ পচা গন্ধে ওর বুকের কাঠিতে পোকায় ধরবে।”[৬]

তবুও বেঁচে থাকার তাগিদ অর্থের প্রয়োজনে কিশোর বয়সেই পরান এই অস্বাস্থ্যকর ভয়ঙ্কর পরিবেশে কাজে যোগ দিয়েছে। আর সমাজের কিছু মানুষ অল্প খরচে পরানের মতো শিশুদের কাজে নিযুক্ত করেছে। মহাদেব দাসের মতো মানুষরা এই ছোট শিশুদের যৌন হেনস্থা করতেও ছাড়ে না। তা গল্প পড়ে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি –

> “মহাদেব যেন আবেগে জড়িয়ে ধরে পরানকে। দু’হাত দিয়ে পিষতে থাকে। ...পরানের গালে মহাদেব দাসের লালা। তরে বাগড়া দিয়া কইছিল না হুটেলের মালিক, তর বুকের কাঠি পোকায় খাইবো, কিন্তু দ্যাখ মাছ খাইয়া তর বুকে মাংস লাগছে, পাছায় মাংস লাগছে, কেমন সুপুরুষ হইছস। মাংসের পরিমাপ করতে থাকে মহাদেব। ...শরীলডারে একটু টিপ্যা টুইপ্যা দে দেখি, এই পাশডা একটু দে, লাজের কি, তুই মরদ, আমিও মরদ-দে-। শোল মাছ ধরা শিখস নাই?”[৭]

এইভাবেই শিশু শ্রমিকদের উপর আমাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণির মানুষরা শারীরিক মানসিক এবং যৌন হেনস্থা করে থাকে। গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর বর্ণনার গুনে গল্পে সুন্দরভাবে তা উপস্থাপিত করেছেন।

শুধু মহাদেব দাস এর মতো আরদদাড়, অশিক্ষিত টাকাওয়ালা সর্দাররাই পরান, গোবিন্দদের মত শিশুদের কম বেতন দিয়ে খাটিয়ে নেয়, তা নয়। আমাদের সমাজের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতরাও কম টাকার বিনিময়ে শিশু শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে থাকে সমাজের নিচু তলার দরিদ্র পরিবারের শিশুদের, গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী সেই দিকটিও গল্পে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। তাইতো গল্পে দেখি ডক্টর দিদিমণিও পরানকে মাসে ৪০ টাকা এবং চানাচুর, কেক, বিস্কুট এবং লজেন্সের লোভ দেখিয়ে তার বাড়িতে গাড়ি পরিষ্কার, ঘর পরিষ্কার, বাজার করার কাজের কথা বলে তাকে নিয়ে গেছে নিজের সঙ্গে কলকাতায়। ডক্টর দিদিমনির সঙ্গে পরানের শহরে যাবার মুহূর্তে গল্পকার বলেছেন –

> “কিছুই ভেবো না তুমি থাকিবে সে সুখে,
> য্যাতক্ষণ আমি আছি ত্যাতক্ষণ দুখে।”[৮]

লেখক তাঁর বর্ণনায় বোঝাতে চেয়েছেন আসলে সমাজের এই বৃত্তশালীরা যতই প্রতিশ্রুতি দিক যে শিশুদের সুখে রাখবে তা যে কতটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং যতক্ষণ এই উচ্চবিত্তরা রয়েছে ততক্ষণ নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুরা সুখে থাকতে পারবে না। যতদিন এই শিক্ষিত শ্রেণির লোক ত্যাগ করতে না পারবে সমাজের বিত্তশালীরা ভোগে মেতে থাকবে, তাদের মধ্যে শুভ বুদ্ধির জাগরণ না হবে, ততদিন শিশু শ্রমিক থাকবে এবং দরিদ্র শিশুদের দুঃখ দূর হবে না। গল্পকার সেকথাই পাঠকদের সামনে সুন্দরভাবে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন।

গল্প শেষে আমরা দেখি পরান ডক্টর দিদিমনির সঙ্গে তার বাড়িতে কাজের জন্য চলে গেল। কিন্তু যাবার সময় তার মনে পড়ছে –

> “আলোমনি কলকাতা গিয়ে আর ফেরেনি। জঙ্গলে গিয়ে পরানের বাবাও ফেরেনি আর।”[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 12
Website: https://tirj.org.in, Page No. 82 - 88
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আলোমনি কলকাতা গিয়ে ফিরে আসেনি খুব সচেতনভাবে এই কথা উল্লেখ করে লেখক আমাদের সমাজের এক ভয়ঙ্কর চিত্রের ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন পাঠকদের কাছে। কলকাতায় গিয়ে ফিরে আসেনি মানে সে পাচার হয়ে গেছে। শিশু পাচার আমাদের সমাজের দণ্ডনীয় অপরাধ তবু আজকের দিনে দাঁড়িয়েও –

> "আন্তর্জাতিক শ্রম (আই.এল.ও) এর ধারণা অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ১০,০০০ শিশু পাচার হয়।"[১০]

তাই গল্পে গল্পকার দেখালেন দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে সমাজের ডক্টর দিদিমণিদের মত মানুষ ভালো কাজের লোভ দেখিয়ে পরানদেরকে শহরে নিয়ে যায় কিন্তু পরানরা আর কোনদিন ফিরে আসে না, পাচার হয়ে যায় ডক্টর দিদিমণিদের হাত দিয়ে হাজার হাজার পরানদের মত শিশু শ্রমিক। লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী সময় সচেতন এবং সমাজ সচেতন শিল্পী তাই তাঁর এই গল্পে সমাজের শিশু শ্রমিক এবং শিশু পাচারে ভয়ঙ্কর এবং করুণ চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে সমাজ দায়বদ্ধতা থেকেই। যা পাঠকদের ভাবান্বিত করতে এবং সচেতন করতে বাধ্য করবে।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'কাননে কুসুমকলি' গল্পে শিশুশ্রমের রক্তাক্ত ছবি ফুটে উঠেছে। গল্পকথক দেবাশিস শিশুশ্রমিকের ওপর একটা ডকুমেন্টারি বানানোর কথা ভাবে। এমন সময় গাড়ি করে যওয়ার পথে কয়েকটি ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েকে জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটার কাজ করতে দেখে। দেবাশিস তাদের দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে প্রত্যেকে চার, পাঁচ ও ছয় কেজি পর্যন্ত করে সারাদিন সুপুরি কাটতে পারে। মজুরি বিষয়ে তারা জানায় —

> "আধা ফালা চার আনা, চৌকো আট আনা, ছক্কা একটাকা, ঝিরিঝিরি দু'টাকা!"[১১]

এরা সকলেই পরিস্থিতির শিকার, কারও মা নেই, কারও মা ভিকিরি, কারও বাবা নেই। দেবাশিস তাদের কাজের ভিডিও শ্যুট করতে যায়। কিন্তু এমন সময় সুপুরি কাটতে কাটতে একটি মেয়ের নখসমেত আঙুল জাঁতিতে কেটে মাটিতে পড়ে চারিদিক রক্তাত্ব হয়ে যায়। এমতাবস্থায় বিপদ বুঝে দেবাশিস ক্যামেরা গুছিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু অনুশোচনায় দগ্ধ আগুন তাকে তাড়া করে বেড়ায়। এমনকি সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। অবশেষে সেই ডকুমেন্টারিটি দিল্লিতে অ্যাওয়ার্ড পেলেও সে খুশি হতে পারে না। বন্ধুদের পরামর্শে সে সিদ্ধান্ত নেয় অ্যাওয়ার্ডের পুরো অর্থ আঙুল কাটা মেয়েটাকে দান করবে। কিন্তু তিনমাস পর সেই টাকা দিতে গিয়ে দেখে এস. এন ব্যানার্জী রোডে বাচ্চারা আর নেই। কেননা সম্প্রতি সরকার থেকে নির্দেশ জারি করে দোকানগুলোতে সুপুরি কুঁচোর মেশিন কিনিয়েছে। বাচ্চাগুলোর খবর ওরাও আর জানে না। তাই দেবাশিস অনেক খুঁজেও তাদের কোন সন্ধান পায়নি। এর বেশ কিছু দিন পর দেবাশিস 'শিল্পগঠনে ব্যাংক' নামে একটি কারখানায় যায় এবং সেখানে গিয়েও দেখে পাঁচ-ছজন বাচ্চা ছেলে কেউ লোহার পাত ঘষছে, কেউ চকচকে ইস্পাতের ফলা টানটান করে ধরে রেখেছে লোহার চাকতির উপর, কেউ বা শান দিচ্ছে। লোহার আওয়াজ ও মেশিনের শব্দ বাচ্চাগুলোর কথাগুলোকে হার মানায়। দুটি বাচ্চা মেয়ের সরু ও নরম আঙুল দিয়ে সূক্ষ্ম তামার তার জড়াতে দেখে, সে ওদের আঙুলগুলো দিকে লক্ষ করে নিশ্চিত হয়। আসলে সে ফুটপাতের বাচ্চা গুলোকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছে না। আঙুল কাটার সেই দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। লেখক অত্যন্ত সচেতন ভাবে দেবাশিস চরিত্রের মধ্যদিয়ে শিশুশ্রমিকের মতো অভিশপ্ত বিষয়টি আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন।

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী 'ভালো করে পড়গা ইস্কুলে', 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা', 'কাননে কুসুমকলি', গল্পগুলিতে শিশুশ্রমের করুণ চিত্র আমাদের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করলেন। 'ভালো করে পড়গা ইস্কুলে' গল্পে লেখক পাঠকদের সামনে তুলে ধরলেন নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের কাছে স্কুলে পড়া স্বপ্ন মাত্র। এই গল্পের বর্ণনায় লেখক পাঠকদের দেখাতে চাইলেন সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষদের শোষণে কীভাবে সমাজের নিচু তলার শিশুরা শ্রমিকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে সেই করুণ চিত্র। যা পাঠ করে সাধারণ পাঠক শিশু-শ্রমিক সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে বাধ্য। আলোচ্য গল্পের আখ্যানে লেখক শিশুদের প্রকৃত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন সমাজের কাছে। 'সর্ষে ছোলা ময়দা আটা' গল্পে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তুলে ধরেছেন সমাজের বৃত্তশালীদের প্রতিশ্রুতির কথা। তারা শিশুদের সুখে রাখার প্রতিশ্রুতি যতই

দিক না কেন বাস্তবে তা ফলপ্রসূ করার কোন ইচ্ছায় সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষদের নেই। গল্পের শেষে লেখক বলেছেন সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষরা যতদিন ভোগ-বিলাসে মেতে থাকবে ততদিন শিশু শ্রমিক বা দরিদ্র শিশুদের দুঃখ দূর হবে না। 'কাননে কুসুমকলি' গল্পে লেখক সুন্দরভাবে শিশু শ্রমিকদের পরিণতি এবং তাদের জীবন যন্ত্রণার আখ্যান পাঠকদের সামনে উদ্ভাসিত করেছেন। একদিকে বলা হয়ে থাকে আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই শিশুরাই শৈশব হারিয়ে স্কুলছুট হয়ে কলকারখানার শ্রমিক, চায়ের দোকানের কর্মচারী, এমনকি মালিকের বাড়ির চাকরে পরিণত হয়। সমাজ বাস্তবতার এই করুণ চিত্র সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর লেখনি স্পর্শে তুলে ধরেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। শিক্ষা শিশুদের মৌলিক অধিকার, কিন্তু অনেক শিশু সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিশুশ্রম নিয়ে একের পর এক আইন সংশোধিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিশুশ্রম মুক্ত সমাজ গড়তে আমরা অসমর্থ। বরং আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কম মজুরিতে শিশুদের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে অনবরত। তাই সংবেদনশীল সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী রাজা-রানী, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কিংবা রূপকথা, পরীর কল্প কাহিনি পরিত্যাগ করে শিশুশ্রমকে সাহিত্যের বিষয় করে তুললেন। এবং সেই সঙ্গে সকল স্তরের সচেতন মানুষকে মানবিক হওয়ার বার্তা প্রেরণ করার প্রয়াস করেছেন। যা সাধারণ পাঠককে শিশু শ্রমিক সম্পর্কে সচেতন হতে এবং সমাজকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে ভাবাতে বাধ্য করে।

Reference:

১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠগল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জুন, ২০১৯, পৃ. ২১
২. তদেব, পৃ. ২২
৩. তদেব, পৃ. ২২
৪. তদেব, পৃ. ২৪
৫. তদেব, পৃ. ৯
৬. তদেব, পৃ. ১১
৭. তদেব, পৃ. ১২
৮. তদেব, পৃ. ১৫
৯. তদেব, পৃ. ১৬
১০.https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0
১১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, 'শ্রেষ্ঠগল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, জুন, ২০১৯, পৃ. ৫৩